SUMMER INTERNSHIP PROJECT

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

মডিউল: BENG 3415101

ঐতিহ্য অন্বেষণ ও সংবাদ পত্রে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন: শিখন ও প্রকাশন

সাম্মানিক স্নাতক পর্যায়

বর্ষ:3 rd

সেমিস্টার: 5th

রেজি নং: 23102110013

নাম: অভিজ্ঞান পানিগ্রাহী

বাংলা বিভাগ

২০২৫

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA

বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

This is to certify that the student bearing registration no-23102110013 of this department has carried out the dissertation for the paper BENG341SI01 titled ঐতিহ্য অন্বেষণ ও সংবাদ পত্রে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন: শিখন ও প্রকাশন under my supervision, for the partial fulfilment of B.A. degree in Bengali of this University.

Head of Department
Name: Uttam Kumar Biswas

Signature:

Seal:

Date:

Supervisor
Name: Mostak Ahamed

Signature:

Seal:

Date:

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
স্থান কাল বিষয়বস্তু	৪-৫
অবলম্বনকারী পদ্ধতি	৫
লক্ষ্য	৫
দৈনন্দিন কার্য প্রনালী	৫-১৪
ইন্টার্নশিপের ভবিষ্যৎ	১৪
সংজজিত	
লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্র নির্মাণ	১৬-৪৪
'ব্রাত্যদেবীর রুদ্ধ সঙ্গীত: সপ্তভগনীর আখ্যান'	

আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহিত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক সৃজন ৪৫-৫১

'বিচ্ছিন্ন ঘোড়ার একাকিত্ব: হেষা ক্রন্দনে কাঁথা থেকে পুতুল'

সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ৫২-৫৩

উপসংহার ৫৪

ভূমিকা

অচেনাকে চেনা ও অজানাকে জানার খিদে মানুষকে বড়োই ক্ষুদার্থ করে তোলে। এই খিদে থেকেই আমার এই ইনটার্নশিপ সূচনা। গ্রামের বাড়ি মেদিনীপুরে হওয়ায় ছোটো থেকেই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে চেনার সুযোগ হয়। চণ্ডী, শীতলা, মনসার সঙ্গে সঙ্গে দেবী সপ্তভগিনী এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোক দেবী। অচেনা এই দেবী সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ আমাকে অনেক দিন থেকে উদ্গ্রীব করে তুলে ছিল। এই ইনটার্নশিপ মাধ্যমের তার খানিকটা চেষ্টা করেছি। ইনটার্নশিপ যেহেতু একটি কর্ম শিখন ভিত্তিক প্রক্রিয়া তাই এক্ষেত্রে আমি গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রক্রিয়া শেখার চেষ্টা করেছি। সংগ্রহশালা যেহেতু সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান , তাই এই কাজটি আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টসের তত্ত্বাবধানে করেছি। উক্ত সংগ্রহশালায় অনুষ্ঠিত ইনটার্নসিপ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক ক্লাস হয়। যার ভিত্তিতে আমি কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। এই সুবাদে গবেষণা পদ্ধতি ও সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি শেখার সঙ্গে সঙ্গে মিউজিয়ামের কিছু কাজও শেখার সুযোগ হয়েছে।

গণশক্তি পত্রিকার অফিস থেকে লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক প্রতিবেদন রচনার একটি ইন্টার্নশিপ করেছি। এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কতগুলি পর্বে বিভক্ত করা যায়।

যেমন-

অভ্যন্তরিণ পর্ব- চার দেওয়ালের ভেতরে

প্রবাহমান জগতের এক ক্ষুদ্র রূপ হল সংগ্রহশালা। মানুষের দৈনন্দিন যাপনকে সংগ্রহ করে এই কক্ষ। ইতিহাসের বৃহৎ কাল পর্ব ক্ষনিকের পরিসরে ধরা দেয় চার দেওয়ালে। সংগ্রহশালায় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে জগতের বৃহৎ প্রাণকে উপলব্ধির সুযোগ ঘটেছে।

বাহির পর্ব- 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া'

মানুষ নিয়েই এই জগৎ। আর মানুষের কার্যকলাপের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। তাই লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক গবেষণামূলক কাজ মানুষ ছাড়া হয় না। নামতে হয় মাঠে, হাত দিতে হয় মাটিতে, ঘাঁটতে হয় ধুলো। এই কাজটির ক্ষেত্রে আমাকে মানুষের সঙ্গে মিশতে শিখতে হয়েছে। উপলব্ধি করেছি মানুষের সঙ্গে মেশা ও ব্যবহার করা এবং আপন করে নেওয়ার মধ্যেও আছে শিখন পদ্ধতি।

ঘর ও বাহির পর্ব- দেহ ভাবে মিলে মিসে পরমেরে পাই

সংগ্রহশালার মধ্যে শিখন পদ্ধতি ছিল প্রধানত চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ। আবার ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ ছিল প্রধানত বাইরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি শেখা। কিন্তু এই কাজটি শেষ করার জন্য আমাকে চার দেয়ালে শেখা পদ্ধতি

এবং চার দেওয়ালের বাইরে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা বিভিন্ন তথ্যের মিশেলে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। আমি প্রধানত সংগ্রহশালায় হওয়া বিভিন্ন ক্লাসের ভিত্তিতে শক্ত ভগিনীর কাজটিকে কিভাবে গবেষণামূলক পদ্ধতিতে সাজাতে হয় তার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।

স্থান ও কাল এবং বিষয় বস্তু

স্থান

এনইপি ও পাঠক্রমের নির্দেশানুসারে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ শিখেছি, ভূমিকা অংশে তার উল্লেখ করেছি। নিম্নে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হল-

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে, ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা, আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট স্থাপিত হয়। এই মিউজিয়ামটির প্রথম পরিচয় হলো এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালাটি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রহশালামুখী শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করে চলেছে। মিউজিয়ামের প্রথম অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবিপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন-ঔনিবেশিক প্রভাবের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বদেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় গড়ে তোলাই এই সংগ্রহশালার কর্তব্য।

সামগ্রিকভাবে মিউজিয়ামটি দুটি তলা নিয়ে গড়ে উঠেছে। নিম্ন তলে পূর্ব ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্য, অপরটিতে টেরাকোটা এবং পাথরের ভাস্কর্য, টেরাকোটার ফলক, হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়পুর প্রভৃতি এলাকার প্রত্নদ্রব্য সজ্জিত আছে। দ্বিতীয় তলায় লোকশিল্প এবং চিত্রকলা সঞ্চিত আছে। এই সংগ্রহশালাটির প্রধান লক্ষ্য হলো যারা ইতিহাস গড়েন, যারা ইতিহাসের কারিগর মিউজিয়ামের মাধ্যমে তাদেরকে তুলে ধরা।

কাল

৩.৭.২৫- ২৩.৭.২৫ তারিখ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহ্যের অনুসন্ধান মূলক একটি ইন্টার্নশিপ করেছি।

এর সঙ্গে সঙ্গে তা কী ভাবে খবরের কাগজজাত করা যায় তার জন্য গণশক্তি পত্রিকায় ২ মাস ব্যাপি ইন্টার্নশিপ করা হয়েছে।

বিষয় বস্তু

১. ক্ষেত্রসমীক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেখা এবং তার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্র করতে শেখা।

২. সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধাপ অবলম্বনে গবেষণামূলক পত্র লিখতে শেখা।

৩. তা জনসমক্ষে প্রকাশের পদ্ধতি শেখা।

৪. মূর্তি তত্ত্ব চর্চা (আইকনগ্রাফি) অভ্যেস করা।

৫. বিষয়টির সঙ্গে মিউজিয়ামের সম্পর্ক থাকায় মিউজিয়ামের কিছু কাজ শেখা।

অবলম্বনকারী পদ্ধতি (Method of Internship)

১. *ক্ষেত্রসমীক্ষা (field survey)-*

ক্ষেত্রসমীক্ষা হল কোনো অঞ্চলে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘরে দেবী সপ্তভগিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. *নৃকুলবিদ্যা অবলম্বন (ethnography)-*

যে অনুসন্ধান মূলক প্রক্রিয়ায় কোনো অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কৃষ্টিগত মিল খোঁজা হয় তাকে নৃকুলবিদ্যা বলে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র গবেষককে গবেষণা ক্ষেত্রে (field) দীর্ঘদিন থেকে ওই অঞ্চলের সামাজিক সচক যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অনুসন্ধান করতে হয়। আবহাওয়া ও ভূতাত্ত্বিক গঠন লক্ষ্য করতে হয় । তার ভিত্তিতে ওই অঞ্চলের ভাষা, নৃতত্ত্ব এবং কৃষ্টিকে খোঁজার চেষ্টা করতে হয়।

এ ক্ষেত্রে মেদিনীপুর ও উৎকল সংলগ্ন সীমান্তে দীর্ঘদিন থেকে ওই অঞ্চলের কৃষ্টিকে অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে দেবী সপ্তভগিনীর সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. *মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ*

এই অংশটি ক্ষেত্র সমীক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু পরিবেশ, মানুষের আবেগ ও চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করে এই পদ্ধতি গ্রহন করতে হয়েছে। বিষয়টি যেহেতু ধর্মনির্ভর কাজ তাই সংস্কার, রীতিনীতি, ট্যাবু ইত্যাদির উপর পর্যবেক্ষণ করে তথ্য গ্রহন করতে হয়েছে।

লক্ষ্য

১.সাধারন মানুষের সঙ্গে মিসতে শেখা।

২.অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলে খুব সহজে মন বোঝার চেষ্টা করা।

৩. গোষ্ঠীর ভাগনে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করা।

৪. ঐতিহ্যবাহী বস্তুর গুনগত মান বোঝার চেষ্টা করা।

৫. ঐতিহ্যবাহী বস্তুর সংরক্ষণ পদ্ধতি শেখা।

৬. নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে বর্তমান ভেদাভেদের রাজনৈতিক যুগে সবধরনের ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ।

৭. কোম ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর শিল্প ও শিল্পী সংরক্ষণ।

দৈনন্দিন কার্য প্রনালী

৩.৭.২৫

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও পদ্ধতি

দীপক কুমার বড়ো পণ্ডা

তত্ত্বাবধায়ক, আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে প্রধানত আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব ও চর্চা পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। মূল স্রোতের ইতিহাসের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের লিখিত নথিপত্র (যেমন সরকারি নথি, সংবাদপত্র, পুরনো চিঠি), মৌখিক উৎস (যেমন লোককথা), প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (যেমন পুরনো জিনিসপত্র) এবং ক্ষেত্র সমীক্ষা (যেমন পুরনো বাড়ি, মন্দির, রাস্তা পরিদর্শন) এর ইতিহাস হল আঞ্চলিক ইতিহাস । এসব তথ্যের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অতীত , সংস্কৃতি, এবং সামাজিক বিকাশের ধারা বোঝা সম্ভব হয়। একজন সাধারণ মানুষকে আঞ্চলিক ইতিহাসে উৎসাহী করার

পদ্ধতিও এই ক্লাসে শেখানো হয়। পরিবার ও পদবীর ইতিহাস চর্চা এবং কালানুক্রমিক (cronology) পদ্ধতির ভিত্তিতে বংশতালিকা (famaly tree) নির্মাণ শেখানো হয়।

৪.৭.২৫

সংগ্রহশালায় উপাদান নথিভুক্তিকরণ পদ্ধতি

সঞ্জীব জোতদার

অধ্যাপক, মিউজিয়োলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে প্রধানত সংগ্রহশালায় বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি ও তা প্রদর্শনের নিয়ম শেখানো হয়। সংগ্রহশালার ডকমেন্টেসনের ক্ষেত্রে উপাদানটির লেবেলিং ও রেপ্লিকা তৈরির পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উপাদানটি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি শেখানো হয় এবং প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন কানুনের বর্ণনা করা হয়।

৭.৭.২৫

পট ও পটুয়াদের কথা

দীপক কুমার বড়ো পণ্ডা

তত্ত্বাবধায়ক, আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে পটচিত্র ও পটুয়াদের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রধানত কালীঘাট পট ও গাজীর পট নিয়ে আলোচনা করা হয়। সময় এর সঙ্গে সঙ্গে পটুয়াদের যাপন চিত্রের পরিবর্তন তুলে ধরা হয়। লোক গোষ্ঠীর যাপন পরিবর্তনে লোক শিল্পের পরিবর্তন ঘটে। লোক শিল্পের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখে লোক গোষ্ঠীর সত্তার সম্পর্কে উপলব্ধির পদ্ধতি শেখানো হয়।

৮.৭.২৫

চিত্রকলায় ইউরপীয় নবজাগরণ : বিশ্লেষণ ও বিচার পদ্ধতি শিখন

দেবপ্রিয় কর,

ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে এথেন্সের চিত্রকলায় প্রকাশিত ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাব তুলে ধরা হয়।এথেন্সীয় বিভিন্ন চিত্র রীতি ও চিত্র শিল্পী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মানুষের চেতনা কী ভাবে চিত্রকলাকে নিয়ন্ত্রন করে ও তা কীভাবে ঐতিহ্যের দলিল হয়ে ওঠে তা আলোচিত হয়। চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে নবজাগরণের প্রভাব ও সম্পর্ক তুলে ধরা হয়।

সংগ্রহশালার দুটি তল প্রদক্ষিণ করে সংরক্ষিত উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা হয়।

৯.৭.২৫

শবর গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্ব

জলধর শবর

সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ শবর কল্যাণ সমিতি

এই আলোচনা সভায় খেড়ীয়া শবর গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। শ্রী জলধর শবর তাঁর কণ্ঠে শরর ভাষায় বাঘমুণ্ডি পাহাড়ের আখ্যান গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এর সঙ্গে শবর হস্তশিল্পের নির্মাণ পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। সংগ্রহশালা কীভাবে এই শবর গোষ্ঠীকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা হয়।

১০.৭.২৫

ইন্টারভিউ গ্রাহকদের ভূমিকা

দীপক কুমার বড়ো পণ্ডা

তত্ত্বাবধায়ক, আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে ইন্টারভিউ গ্রহীতা ও রিপোর্টিয়ারের কর্তব্য আলোচনা করা হয়। ইন্টারভিউ গ্রহীতা ইন্টারভিউটি নেবেন। রিপোর্টিয়ার সেটিকে গুছিয়ে লিখিতরূপে উপস্থাপন করবেন।

ব্যক্তি	কাজ
ইন্টারভিউ গ্রহীতা	সাক্ষাৎকারদাতার পরিচয়, কাজ, প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা নিয়ে প্রশ্নের একটি সুশৃঙ্খল তালিকা তৈরি করা। বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় নথি প্রস্তুত রাখা। ব্যক্তিগত মতামত চাপিয়ে না দেওয়া। উপযুক্ত ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করা ও অনুমতি নিয়ে অডিও বা ভিডিও রেকর্ড করা।
রিপোর্টিয়ার	অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেছে নেওয়া। তথ্যকে যুক্তিসংগতভাবে সাজানো। সময়, স্থান, সংখ্যা, ঘটনা— সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

১১.৭.২৫

লোক নাটকের ঐতিহ্য অনুধাবন

সন্দিপ মন্ডল,

ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়

এই ক্লাসে প্রধানত লোক নাটকের ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের লোক নাটকের সঙ্গে বাংলার লোক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। যাত্রার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশ্চাত্যের নাট্য ধারার সঙ্গে লোক নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়।

১২.৭.২৫

প্রযুক্তির ভিত্তিতে স্থাপত্য মূলক ঐতিহ্য সংরক্ষণ

কৌশিক বাল,

ডেভলাপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তার বিরণ দেওয়া হলো-

১. ড্রোন ম্যাপিং, ফটোগ্রামেট্রি, জিআইএস ও জিপিএস ম্যাপিং ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে স্থাপত্যটির আকার অবস্থা, ক্ষয় এর পরিমান ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হয়।

2. উপাদন বিশ্লেষণ- পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রাসায়নিক ও ভৌত গুণাবলি চিহ্নিত করা হয়।

3. আধুনিক মনিটারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্ষয়ের কারণ ও উৎস নির্ধারণ করা হয়।

4. সংরক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

5. জনসচেতনতা ও প্রত্যহিক রক্ষণাবেক্ষণ বৃদ্ধি করা হয়।

১৫.৭.২৫

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও মানবাধিকার

মধুরিমা চৌধুরী,

সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল

এই ক্লাসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের উপর আলোচনা করা হয়। একজন ঐতিহ্য সংরক্ষক হিসেবে কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা উচিত।

২০০৬ এর Forest Right Act অনুযায়ী individual forest rights ও community forest rights রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই আইন মোতাবেক কোম ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর

ক. জীবন ও নিরাপত্তার অধিকার , খ. ভূমি ও সম্পদের অধিকার, গ. ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকারের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১৬.৭.২৫

লগারিদমের মাধ্যমে কার্বন ডেটিং পদ্ধতি শেখা

সুদীপ কুন্ডু,

গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল

এই ক্লাসে গাণিতিক লগারিদম পদ্ধতিতে কার্বন ডেটিং এর হিসেব শেখানো হয়। তেজস্ক্রিয় C14 কার্বনের মাধ্যমে লগারিদমের অনুপাতিক নিয়মে কীভাবে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের বয়ষ নির্ধারণ করা হয় তা শেখানো হয়।

১৭.৭.২৫

ফটোগ্রাফি ও ঐতিহ্য

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আঁকা ছবির গুনগত মান মনব মনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ক্যামেরায় তোলা ছবি মানুষের চোখের উপর নির্ভর করে । সেখানে প্রকাশ পায় একজন ফটোগ্রাফারের মানসিকতা। ঠিক একই ভাবে ঐতিহাসিককেও এই চোখ তৈরি করতে হয়। এই ক্লাসে ফটোগ্রাফির সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৮.৭.২৫

মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ পদ্ধতি

সহিনী গাঙ্গুলি,

আইন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে প্রধানত মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহের পদ্ধতি শেখানো হয়। এর শর্ত গুলি নিম্ন রূপ

উদ্দেশ্য নির্ধারণ

তথ্যদাতা নির্বাচন

প্রশ্ন-নির্দেশিকা প্রস্তুত

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতিলিপি তৈরি

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

নৈতিক দায়বদ্ধতা রক্ষা

কোনো কোনো সময় মৌখিক ইতিহাস সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এক্ষেত্রে তথ্য দানকারীর মানসিক ভাব ও আবেগ বুঝে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

২১.৭.২৫

শিক্ষা পদ্ধতি ও ছাত্র নির্মাণ

জয়ন্তী দে

শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে শিক্ষা দান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকৃত শিক্ষকের কর্তব্য ও গুরুত্ব আলোচিত হয়। প্রকৃত মানব সত্তার বিকাশে ঐতিহ্যের বিকাশ এই মন্ত্রই দান করা হয়।

সংগ্রহশালার শ্রেণিবিভাগ ও বিবর্তন

২২.৭.২৫

শর্মিলা গুপ্ত,

ট্রাইবাল স্টাডিজ বিভাগ,সিধু-কানু- বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

এই ক্লাসে প্রধানত সংগ্রহশালার ইতিহাস আলোচিত হয়। এর সঙ্গে সংগ্রহশালার বিভিন্ন ধরণ নিয়েও আলোচনা করা হয়। মিউজিয়ামের বিবর্তনের ধারা ও বর্তমান মিউজিয়াম ভাবনা তুলে ধরা হয়।

২৩.৭.২৫

রক্তিম বিপ্লব ও হুল দিবস

শান্তা দত্ত

প্রাক্তন আচার্য,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হুল দিবসের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়। বিপ্লব ও বিদ্রোহ আমাদের প্রবৃত্তির অংশ এই সত্য তুলে ধরা হয়।

সংবাদপত্রে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে প্রতিবেদন লেখার রীতি

১. শিরোনাম (Headline)

শিরোনামটি সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট হতে হবে। যাতে আলচ্য বিষয়টি বোঝা যায়।

২. উপশিরোনাম / লিড-লাইন (Sub-headline / Lead Line)

উপশিরোনাম মূল ঘটনাটিকে এক লাইনে স্পষ্ট করে বলে দেয়। ফলে পাঠকের আগ্রহ তৈরি করে।

৩. ভূমিকা (Introduction / Lead Paragraph)

বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য দানকারীর কাছ থেকে ৫টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর:

কী (What),কথায় (Whe্তহায়() কখন (When) , কে (Who) এবং কেন /কীভাবে (Why / How) জানতে হবে। শুরুতেই ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। লোকসংস্কৃতির জরুরি দিক (যেমন আলচ্য বিষয় বা বস্তুটির বিলুপ্তি, পুনর্জাগরণ, সমস্যা, সুযোগ) তুলে ধরতে হবে। ।

৪. বিষয় উপস্থাপন (Body of the Report)

ক) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে হবে।

লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য, উৎপত্তি ও সমাজে তার গুরুত্ব আলচনা করতে হবে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিষয়টি যোগসূত্র তুলে ধরতে হবে।

খ) বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে সেই লোকশিল্প/লোকসংস্কৃতির অবস্থা—

১.উন্নতি,২. সংকট, ৩. সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ, ৪.মানুষের আগ্রহ তুলে ধরতে হবে।

গ) সাক্ষাৎকার

শিল্পী, গবেষক, স্থানীয় মানুষ, আয়োজক, প্রশাসন এর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃ প্রতিবেদনকে শক্তিশালী করে।

ঘ) বিশ্লেষণ

লোকসংস্কৃতির সমাজ–অর্থনীতি–পরিবেশে প্রভাব।

বাণিজ্যিকীকরণের সুফল-কুফল প্রজন্মান্তরের সঙ্কট তুলে ধরতে হবে।

৫. সমাপনী অংশ (Conclusion)

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা উদ্বেগের কথা তুলে ধরতে হবে

ইন্টার্নশিপের ভবিষ্যৎ

১. বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন গবেষণামূলক রচনার, ধরণ ও শৈলীগত পার্থক্য থাকে। সংস্কৃতি কেন্দ্রিক গবেষণা লিখনেরও বিশেষ পদ্ধতি আছে। এই ইনটার্নশিপটি কোনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কেন্দ্রিক গবেষণা পত্রে বা অনলাইন মাধ্যমের কোনো ওয়েবসাইটে লেখালিখির দিশা দেখাতে পারে।

২. ভ্রমন নির্দেশক (tour guide) হিসেবে কর্ম সংস্থান- এই ইন্টার্নশিপ টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক ভ্রমন নির্দেশকের দিশা দেখাতে পারে।

৩. সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন- সাধারনত প্রত্যেক কোম ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব হস্থ শিল্প থেকে থাকে। এই উপাদানগুলিকে বাজারজাত করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা যেতে পারে।

৪. গবেষণা ও একাডেমিক দিক- এই ইন্টার্নশিপটি ঐতিহ্য চর্চা (heritage studies), ইতিহাস, নৃতত্ত্ব বা সংস্কৃতি চর্চায় (cultural studies) উচ্চতর গবেষণার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

৫. নিজের অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সংগ্রহশালা তৈরি ও সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক রূপে অংশ গ্রহনের সুযোগ হতে পারে

ব্রাত্য দেবীর রুদ্ধ সঙ্গীত

সপ্তভগিনীর আখ্যান

কর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রশিক্ষন প্রক্রিয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত ঐতিহ্য অনুসন্ধান মূলক গবেষণা পত্র

অভিজ্ঞান পাণিগ্রাহী

রোল নম্বর-BENG013

তৃতীয় বর্ষ, সেমিস্টার৫

ইন্টার্নসিপ রোল নম্বর – 18

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নম্বর- 23102110013

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দীপক কুমার বড় পণ্ডা

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই কাজটি আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের কিউরেটর ড. দীপককুমার বড়পন্ডার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি এজন্য তাঁর প্রতি বিশেষ ভাবে কতজ্ঞ।

এছাড়া যে সকল বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণী মানুষজন তথ্য সরবরাহ করে কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে সাহায্য করেছেন, যেমন শ্রদ্ধেয় শ্রী অরবিন্দ মাইতি, শ্রদ্ধেয় সেক্ নাসির আলী, শ্রীযুক্ত অনন্ত কর এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন ঘড়ুই প্রমুখের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ, এঁদের অকৃত্রিম সাহায্য এবং তথ্য দান ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কাছে আমি এই কাজটির জন্য বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। উপরন্তু আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়সজন সকলের কাছে এই কাজটির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই|

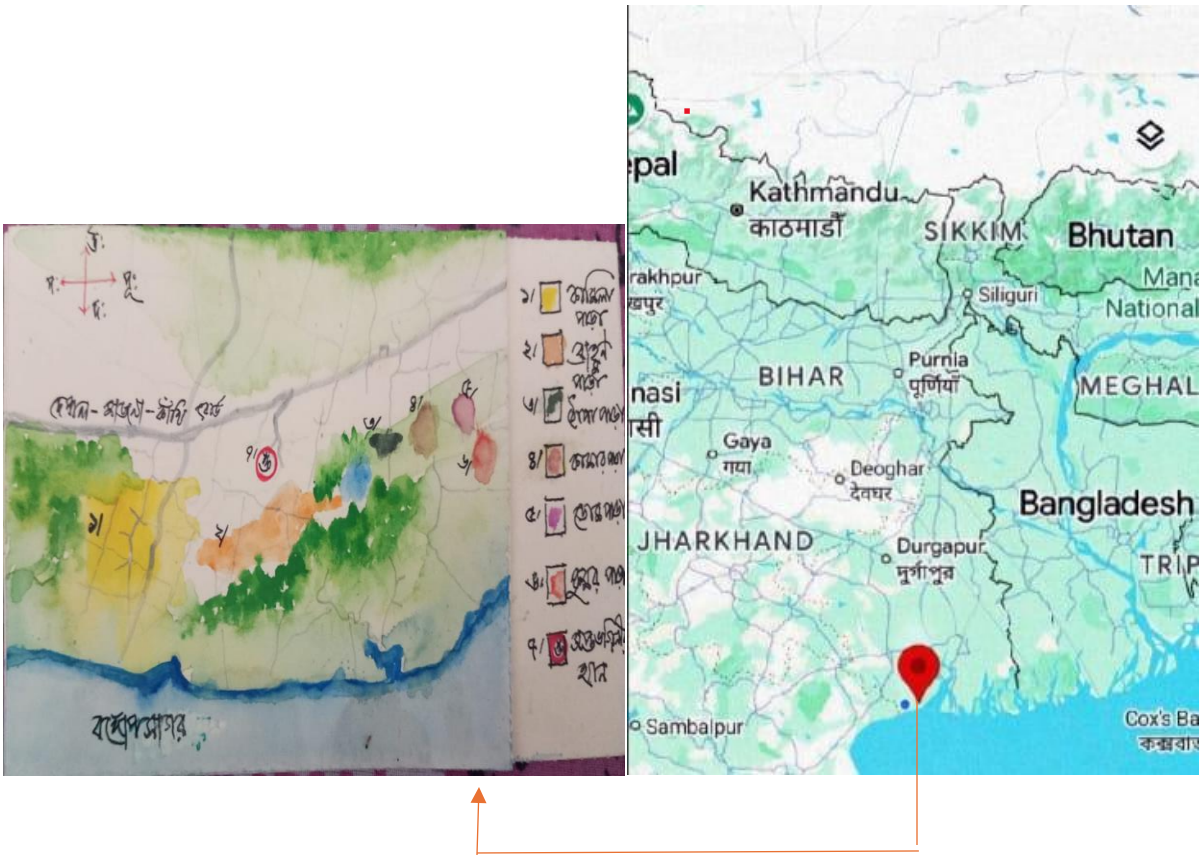

মৈতনাগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান

গ্রামটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার,কাঁথি মহকুমার,রামনগর ব্লকের অন্তর্গত।

এর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ গত অবস্থান যথাক্রমে

21.7354714 এবং 87.6211857

পদ্ধতি

একটি গবেষণাধর্মী কাজে পদ্ধতি অবলম্বন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই কাজটির জন্য পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত মৈতনা গ্রাম সম্পর্কে ধারনা সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিভিন্ন বইপত্র ও গবেষণা পত্রে দেবী সপ্ত ভাগনীর সম্বন্ধে জানতে হয়েছে। তারপর মৈতনা ও তৎসংলগ্ন গ্রামে সপ্ত ভগিনীর থান খুঁজে বের করা হয়েছে। ফিল্ড ওয়ার্ক ,ইন্টারভিউ এবং ছবি সংগ্রহের এর মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। সংগৃহীত বিভিন্ন অঞ্চলের সপ্ত ভগিনীর মধ্যে মিল এবং অমিল খোঁজা হয়েছে। দেবীর থান সংলগ্ন বসবাসকারী মানুষজনের নৃতাত্ত্বিক গঠন ও যাপনগত সংস্কৃতি পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। বিভিন্ন থানের মৌখিক ইতিহাস ও প্রচলিত মিথের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রাথমিক তথ্য গুলিকে ক্রমান্বয়িক ভাবে সাজিয়ে এবং বিশ্লেষণ করে লেখাটি সম্পন্ন হয়েছে।

উদ্দেশ্য

কোনো অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ।

ক. বস্তু ভিত্তিক (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সামাজিক সূচক)

খ. অবস্তু ভিত্তিক (লোক সাহিত্য)

সাধারনত কোনো একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি কেন্দ্রিক গবেষণায় আমরা ওই অঞ্চলের এই দুটি সত্বার অনুসন্ধান করি। কিন্তু এই কাজটির উদ্দেশ্য হল বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন। যেখানে আমরা দেখব লোক বিশ্বাস (যার অন্তর্গত লৌকিক দেবীদের ধারনা) যা বস্তু ভিত্তিক ধারার অন্তর্গত, তার ভিত্তিতে কীভাবে একটি গ্রামের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায়।

সারাংশ

ধর্ম ,চণ্ডি বা শীতলা হলেন লৌকিক দেবদেবী । কিন্তু আমাদের আলোচ্য সপ্তমাতৃকা একটি ধারনা।ফলে এই বিষয়টি একটি অঞ্চলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই কারণে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই এই দেবী -পূজার রীতি ছড়িয়ে রয়েছে। একসময় এই সপ্তমাতৃকা শাস্ত্রীয় রীতিতে রাজন্যবর্গ নির্মিত মন্দিরে পূজিত হত। কিন্তু আজ লৌকিক স্তরে স্থান পেয়েছে। বর্তমানে এই সংস্কৃতিটি প্রধানত উড়িষ্যা অঞ্চলেই প্রকট । পূর্বে এই দেবী প্রধানত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দ্বারা পূজা পেতেন। পরে বর্ণহিন্দু তথা ব্রাহ্মণদের হাতে তা যায়।

স্কুল কলেজের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্লাসে আমরা মঙ্গল দেবদেবীদের সম্পর্কে পড়ি। কিন্তু আঞ্চলিক স্তরে তাঁদের রূপ কেমন তা আমরা দেখি না। বর্তমান কালে এই সকল দেবদেবী লৌকিক হলেও তাদের সত্বা আর লৌকিক নেই। এই আলোচনায় আমরা দেখব সীমান্ত বাংলায় দেবী শীতলা ও চণ্ডি কীভাবে একটি অপ্রচলিত লোকায়ত দেবী সপ্তভগিনীর সঙ্গে মিলেমিসে একাকার হয়ে উঠেছেন।

সূচনা

দেবতার স্থান সর্বদা সবার ওপরে। তিনিও যে লৌকিক স্তরে বিরাজ করতে পারেন এটা আমরা আপাত ভাবে ভাবতে পারি না। কিন্তু একদিন দেবতা হয়ে ওঠেন সমাজের উচ্চ বর্গীয় মানুষের সম্পদ। তাই এই সকল দেবদেবীর উৎস খুঁজতে গেলে মাঠে নামতে হয়, মাটিতে পা দিতে হয়। কিন্তু সত্যকে কখনো চাপা দেওয়া যায় না। তাই সে বেঁচে থাকে মানুষের মুখে মুখে---স্মৃতি থেকে শ্রুতিতে। প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রধানত বিভিন্ন দেবদেবীর আখ্যান কেন্দ্রিক। পদাবলী সাহিত্য যেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী নির্ভর, সেখানে মঙ্গলকাব্য ধর্ম, শীতলা, চণ্ডী ও মনসা ইত্যাদি দেবদেবীর কাহিনী নির্ভর। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে অনেকেই লৌকিক দেবদেবী থেকে উচ্চ বর্গীয় মানুষের আরাধ্যে পরিণত হয়েছেন।সাহিত্য তাদের মাহাত্ম্যকে মহিমান্বিত করেছে। আমাদের কেন্দ্রীয় আলোচনার মূল দেবী সপ্ত ভগিনী সেই অর্থে কখনোই লৌকিক পর্যায় থেকে মন্দিরের দেবী রূপে চিরন্তন ভাবে পূজিত হতে পারেননি। সময়ের আবর্তে সপ্তভগিনী কোন কোন সময় চণ্ডী বা শীতলার মতো মর্যাদার স্থান পেলেও বর্তমানে তিনি খুবই উপেক্ষিত এবং পথের ধারে গাছের তোলার দেবী হিসেবেই রয়ে গেছেন।আমাদের সমগ্র অনুসন্ধান এবং আলোচনা এই সপ্তভগিনীর উৎপত্তি ,বিবর্তন এবং বর্তমান পর্যায়ে তার অবস্থান উদঘাটনে নিয়োজিত।

উৎস

প্রকৃতি ও পুরুষ এর সংমিশ্রনেই এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি। এই দুই উপাদানের যৌথ আদান প্রদানেই জগতের অগ্রগতি। প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই মানুষ তার জীবনের পথচলা শুরু করেছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তার পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ তার মধ্যে অন্যতম। আকাশের চন্দ্র-সূর্য থেকে সে যেমন আলো পেয়েছে তেমনই দিগ্নির্ণয় করেছে। এবং আকাশের গ্রহমন্ডলী তার উপাষণার উপর প্রভাব ফেলেছে। এই সপ্তভগিনীর উৎপত্তির পেছনে যে সংখ্যা লুকিয়ে আছে তা হল ৭। এক্ষেত্রে এই ৭ এর আগমন আকাশ থেকেই।

যা ডেভিড কিনসলে তাঁর 'হিন্দু দেবী: হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের দর্শন' বইতে উদ্ধৃত করেছেন। কিনসলের মতে এই সাত দেবী হলেন কৃত্তিকা নক্ষত্র ৬ টি তারা । কৃত্তিকারা ছিলেন সাত ভাইয়ের সাথে বিবাহিত সাত বোন। সাত ভাই ছিলেন সপ্তঋষি , বিগ ডিপার নক্ষত্রমণ্ডল গঠনকারী নক্ষত্র। সাত ঋষি এবং তাদের স্ত্রীরা একসাথে থাকতেন, যতক্ষণ না একদিন সপ্তঋষিরা ছয় বোনের উপর অবিশ্বাসের অভিযোগ আনেন এই বলে যে -তারা অগ্নির প্রেম পছন্দ করে। সাত ঋষির অভিশাপে এবং ক্ষুব্ধ হয়ে, ছয় কৃত্তিকা তাদের ঘর ছেড়ে চলে যান। সাত বোনের মধ্যে কেবল একজন সাত তারার সাথে রয়ে যান। এই নক্ষত্রটি হল অলকোর বা অরুন্ধতী, যিনি ঋষি বশিষ্ঠের স্ত্রী রূপে পরিচিত ।

নির্বাসিত কৃত্তিকারা ভগবান শিবের পুত্র ভগবান কার্তিকের কাছে এসে তাদের মা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন। কার্তিক রাজি হন । তারা দুটি অনুরোধ করেন। প্রথমটি হল, বিশ্বজুড়ে মহান দেবী হিসেবে পূজা করা। দ্বিতীয়টি হল, মানুষের সন্তানদের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করা। কার্তিকের মা দেবী পার্বতীর সাথে এই ছয়টি কৃত্তিকা সপ্তমাত্রিকা গঠন করে ।

ডেভিড কিনসলির প্রস্তাব অনুযায়ী মাতৃকারা স্থানীয় গ্রামদেবী হতে পারে, যারা মূলধারার সাথে একীভূত হচ্ছিলেন। তিনি তার এই দাবির দুটি কারণ উল্লেখ করেন: মহাভারতে তাদের বর্ণনা কালো রঙের, বিদেশী ভাষায় কথা বলা এবং "পার্শ্বিক অঞ্চলে" বসবাসকারী এবং দেবতা স্কন্দ এবং তাঁর পিতা শিবের সাথে তাদের সম্পর্ক।

মধু ওয়াঙ্গু বাজাজ বলেছেন যে সপ্তমাত্রিকদের কিংবদন্তি প্লিয়েডস নক্ষত্রের সাতটি তারা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। হার্পার এবং ব্রাউন তাদের 'দ্য রুটস অফ তন্ত্র' বইতেও এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন এবং উল্লেখ করেন যে সপ্তমাত্রিকরা বৈদিক কৃত্তিকা বা প্লিয়েডস নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত। কার্তিকেয় কৃত্তিকাদের দ্বারা লালিত-পালিত হওয়ায় তিনি তার নাম কার্তিকেয় পান।

'দ্য সেভেন সিস্টার্স অফ দ্য প্লিয়েডস: স্টোরিজ ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' বইয়ের লেখক মুনিয়া অ্যান্ড্রুজ সপ্তমাতৃকা এবং কার্তিকের মধ্যে এই সংযোগকে সমর্থন করেন এবং কার্তিক মাসে আসা আলোর উৎসব দীপাবলি এবং কৃত্তিকার মধ্যে সংযোগের কথা উল্লেখ করেন । অ্যান্ড্রুজের মতে, ‘দীপাবলির রাতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপগুলি রাতের আকাশে জ্বলন্ত তারার প্রতীক'[৮], অর্থাৎ কৃত্তিকা ।

ভারততত্ত্ববিদ ডঃ পৃথ্বী কুমার অগ্রওয়ালা উল্লেখ করেছেন যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকাদের 'চন্দ্র প্রাসাদের 'মুখ' বা প্রধান' এবং 'প্রজাপতির প্রধান' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সাতটি তারার নাম অম্বা, দুলা, নিতাতানি, অভ্রান্তি, মেঘায়ন্তি, বর্ষায়ন্তি এবং চুপুণিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ঋষভ নামে এক ভাইও ছিল যাকে অগ্নির সাথে চিহ্নিত করা হয়।

শামান হ্যাটলি তার গবেষণাপত্রে লিখেছেন যে 'তাদের মন্দিরের উপাসনার পাশাপাশি, সপ্তমাতারা মধ্যযুগের প্রথম দিকের ভারতে তান্ত্রিক বা "গুপ্ত" শৈবধর্মের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দেবী হয়ে ওঠেন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।'

কৃত্তিকা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল যাকে ত্যাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দূর্গা বাদে ছয় বোন হলেন পতিতা। দূর্গা তাদের গ্রহন করে নিচ্ছেন। দূর্গাকেই পরে চণ্ডী হিসেবে দেখানো হয়েছ ।

নিদর্শন

বিশিষ্ট গবেষক জগদীশ নারায়ণ তিওয়ারি এবং দিলীপ চক্রবর্তীর মতে,

'সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার সময় সপ্তমাত্রিকদের পূজা প্রচলিত ছিল। খননের সময় একটি সীলমোহর পাওয়া গেছে যেখানে সাত দেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে' । (জগদীশ নারায়ণ তিওয়ারি, 'Studies in Goddess Cults in Northern India')।[৭]

ঋগ্বেদে সাতজন স্বর্গীয় নারীর একটি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাঁরা সোমের প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। মহাভারতের বান-পর্বে সপ্তমাত্রিকাদের সাতটি একটি দল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।এখানে কার্তিকের মাতা রূপে সপ্তমাতৃকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে যে, অন্ধকাসুরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভগবান শিব সাত জন দেবীর সৃষ্টি করেছিলেন, যারা অন্ধকাসুরের রক্ত পান করে ভগবান শিবকে ঐ অসুরকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিলেন। ইলোরার কৈলাস মন্দিরে এই চিত্রটির একটি সুন্দর ভাস্কর্য প্যানেল রয়েছে।

দেবী মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে যে, দেবী দুর্গা নিজের থেকে সাতটি ভয়ঙ্কর দেবী সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁদের সাহায্যে মহিষাসুরের অসুরবাহিনীকে বধ করেছিলেন। গল্পের এই সংস্করণে সপ্তমাত্রিকা রক্তবীজ অসুরের সমস্ত রক্ত শোষণ নিয়েছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে সপ্তমাত্রিকাদের ব্যাপক উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতে সাতজন মাকে গাছ, রাস্তা, গুহা এবং শ্মশানে বসবাসকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে , তাঁরা ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর।

ডেভিড কিন্সলে উল্লেখ করেছেন যে নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য ও নাটক পরিবেশনের জন্য মঞ্চ তৈরির আগে সপ্তমাতৃকাদের পূজা করার পরামর্শ রয়েছে । ভাস এবং শূদ্রক উভয়ই তাদের নাটকে সপ্তমাতৃকাদের পথের মোড়ে মোড়ে দেওয়া

নৈবেদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরি কবি কলহন উল্লেখ করেছেন যে, সেই সময়ে কাশ্মীরে শিবের পাশাপাশি সপ্তমাতৃকার পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

ভাষ্কর্যে সপ্রমাতৃকা

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত সপ্ত মাতৃকার পাথর ক্ষোদিত প্যানেল পাওয়া গেছে। গুপ্ত আমলে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, গুর্জর প্রতিহারে খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীতে ,চন্ডেল রাজত্বে খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে, চালুক্য বংশে খ্রিস্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এবং পল্লব ও চোল সাম্রাজ্যে খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীতে সপ্তমাতৃকার নিদর্শন পাওয়া যায় যা থেকে এই কাল্টের (মূর্তি) বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে এই মাতৃকা পূজা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে মাতৃকা প্যানেলগুলি হিন্দু মন্দিরে একটি বিশেষ স্থান লাভ করে।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত ইলোরার রামেশ্বর গুহায় সপ্তমাতৃকার একটি প্যানেল আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে সাত দেবীকে সৌম্য সুন্দর রূপে বিরাজিত হতে দেখা যায়।

সাত দেবীর পৃথক বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তিগত কারণ-

এই সাত দেবী আকাশের তারাদের থেকে নেমে বাস্তবে মূর্তিতে রূপ নিলেন।এই সাত নারী হলেন যথাক্রমে ব্রাহ্মণী ,বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী , কৌমারী, বরাহি, ইন্দ্রানী এবং চামুন্ডা।এই প্রত্যেক নারী মূর্তি হলেন এক একজন পুরুষ দেবতার স্ত্রী লিঙ্গ বাচক রূপ।ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণী।বিষ্ণুর থেকে বৈষ্ণবী। মহেশ্বরী থেকে মাহেশ্বরী ,স্কন্দ থেকে কৌমারি, বরাহ থেকে বরাহি এবং ইন্দ্র থেকে ইন্দ্রানী। কেবলমাত্র চামুন্ডা এই রূপে আবির্ভূত হননি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে চামুণ্ডার কোন বিবর্তিত রূপ এই সাত বোনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। অর্থাৎ চামুণ্ডার সত্তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এর থেকে অনুমেয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবেও তিনি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটেই এই ছয় বোনের পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ এর পেছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিগুলিতে দেখা যায় এই সাত দেবী একই অস্ত্রে সজ্জিত, একই অলংকারে ভূষিত এবং বাহনের দিক থেকেও তাঁদের সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁরা সাদৃশ্য যুক্ত পতাকা নিয়ে থাকেন।

পুরান তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এই মাতৃকা হলেন শিব , ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের শক্তিতে উৎপন্ন এবং এঁরা প্রত্যেকেই যুদ্ধক্ষেত্রের দেবী।কিন্তু ভাষ্কর্যে তাঁরা অনেক নমনীয় , তাঁদের মধ্যে দানশীল করুণাময়

এক কোমল রূপ দেখা যায়।পুরান মতে এই ৭ দেবী ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।পুরাণের আখ্যান থেকে আমরা পাই শিব এবং বিষ্ণু একত্র হয়ে অন্ধক নামক অসুরকে বশ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বারবারই ব্যর্থ হছিলেন। এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা সাত দেবীর উৎপত্তি ঘটান। এই অন্ধকাসুরের মাটিতে পড়া প্রতিটি রক্ত বিন্দু থেকে আরেকটি অসুরের উৎপত্তি হতে থাকে। এমতাবস্থায় এই ৭ দেবী সেই রক্ত পান করে অন্ধকাসুরের বংশবিস্তার রূদ্ধ করেন এবং ভগবান শিব অসুর নিধনে সক্ষম হন।

বামন পুরাণের ৫৬ নম্বর অধ্যায়ের গল্পে সপ্ত মাতৃকার জন্মের আরেকটি আখ্যান পাওয়া যায়।যেখানে দেখা যায় দেবতা এবং অসুররের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ । অসুর রক্তবীজ রথ, হাতি ,ঘোড়া এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। বিশাল সৈন্যদল দেখে কৌশিকী এবং কালী জোরে শব্দ করায় তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসেন মাহেশ্বরী এবং ব্রাহ্মণী। মাহেশ্বরীর সিংহ থেকে বেরিয়ে আসেন কুমারী যিনি ময়ূরের উপরে বসে থাকেন এবং হাতে বর্ষা ধারণ করেন। কুমারীর হাত থেকে বেরন বৈষ্ণবী যিনি গরুড়ের ওপরে উপবিষ্ট হয়ে শঙ্খ,চক্র, গদা, তরবারি, ধনুক এবং তীর ধারণ করেন। তাঁর পশ্চাৎ ভাগ থেকে বেরিয়ে আসেন বরাহী যিনি শেষনাগের উপর উপবিষ্ট হন। তাঁর হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসেন ভয়ংকর নখ যুক্ত নরসিংহিনী।এবং নরসিংহিনীর পা থেকে বেরিয়ে আসেন চামুণ্ডা। ব্রাহ্মণীর চোখ থেকে উৎপত্তি ঘটে মহেশ্বরীর।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাত দেবীর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু উৎপত্তির ক্রম অনুযায়ী তারা পরস্পর পরস্পরের থেকে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। এই তত্ত্বের

উপর ভিত্তি করে এই প্রত্যেক সাত দেবী ভিন্ন ভিন্ন সত্বার অধিকারী হয়ে উঠেছেন। এই বিষয়টাই আমরা পরবর্তী নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় লক্ষ্য করব।

সপ্ত মাতৃকার লৌকিক রূপ-

এতক্ষণ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এই সাত দেবীর উৎপত্তি এবং তাঁদের পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় রূপ।পরবর্তীকালে এই দেবীদের ধারণা বিভিন্ন অঞ্চল সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপে রূপায়িত করেছে।তার মধ্যে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপকরণ।তার ওপর নির্ভর করেই আমরা অঞ্চল গুলোর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারব।যতদিন এই মাতৃকারা রাজাদের মন্দিরে অবস্থান করতেন ততদিন তাঁরা ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির প্রতিভু।যেদিন এই সাত দেবী মন্দির থেকে বেরিয়ে গাছের তলায় মাটির ওপরে,নদীর ধারে স্থান লাভ করলেন,সেদিনই তাদের মধ্যে অঞ্চলের লৌকিক ভাব প্রকট হয়ে উঠলো।যেহেতু আমাদের আলোচ্য

সপ্তমাতৃকা দেবী বাংলার একটি গ্রামে অধিষ্ঠিত তাই সপ্তমাতৃকার আঞ্চলিক রূপ হিসেবে আমরা পূর্ব ভারত এবং খানিকটা দক্ষিণ ভারতের অংশ দেখব।

কিন্তু তার জন্য আমাদের দেখতে হবে দেবী পশ্চিম ভারতে কিরূপে বিরাজ করছেন এবং পূর্ব ভারতে এসে তাঁর রূপের কিভাবে পরিবর্তন ঘটল এবং তা কেন হল।

রাজস্থান

রাজস্থানে সপ্তদেবীকে সম্মিলিত ভাবে সতোবাহিন (আক্ষরিক অর্থে, সাত বোন) হিসেবে পূজা করা হয়। কখনও কখনও তাঁদের ভাই ভৈরু নামে পরিচিত হন, যা ভৈরবের অপভ্রংশ, বীরভদ্রের অপর নাম।

কিছু ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে সপ্ত বোনদের স্মরণ করা হয় এবং তাঁদের জন্য অনুশোচনা করা হয়। বিবাহের সময়, হবু কনেদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাত দেবী এবং তাঁদের ভাইয়ের চিত্রিত একটি রূপালী তাবিজ দেওয়া হয়। হেলেন ল্যাম্বার্টের মতে, এটিই একমাত্র রূপ যেখানে সতোবাহিনকে মূর্তিতত্ত্বের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শ্রাবণ মাসে, মায়েরা সতোবাহিনের প্রতীক হিসেবে তাদের সন্তানের হাতে মেহেন্দি দিয়ে সাতটি বিন্দু আঁকেন। উৎসবের সময় মহিলারা সতোবাহিনকে প্রশংসিত করার জন্য বাড়ির প্রবেশপথের কাছে সাতটি বিন্দু আঁকেন যাতে ঘরে কোনও খারাপ বা অশুভ জিনিস প্রবেশ করতে না পারে।

সতোবাহিনদের কল্পনা করা হয় দেবীদের একটি দল হিসেবে যাঁরা ভোর, সন্ধ্যা এবং দুপুরে একটি চক্রে (ফেরি, চাক্কর) 'ঘোরাঘুরি' (ঘুম্বি) অথবা 'খেলা' (খেলবা) করেন । তাঁরা ঘরের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে যাতায়াত করেন , যেমন পারিন্দা যেখানে পানীয় জল সংরক্ষণ করা হয়, উঠান, যেখানে পাত্র পরিষ্কার করা হয়, দরজার কপাট এবং বাড়ির প্রধান চৌকাঠ। তারা প্রায়শই একটি বটবৃক্ষের নীচেও জড়ো হয়। এই চক্রে সতোবাহিনদের এই চলাচলকে কখনও কখনও 'মাতার তীর' বলা হয়।

গুজরাট

গুজরাটে, সাত ভগিনী দেবী খোদিয়ার এবং তার বোন আভাল, যোগল, টোগল, হোলবাই, বীজবাই এবং সোসাই নামে পরিচিত। তাঁরা গাধবী নামক এক ধার্মিক মন্ত্রীর সন্তান বলে মনে করা হয়। রানী তাঁকে নিঃসন্তান বলে নির্বাসিত করেছিলেন। তিনি ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেন। ভগবান শিব তাঁকে বলেন যে তাঁর নিঃসন্তান হওয়া ভাগ্যে আছে। গাধবী তাঁর জীবন শেষ করার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, কিন্তু ভগবান শিব তাঁকে রক্ষা করেন এবং নাগ লোকে নিয়ে যান। সেখানে নাগ রাজার কন্যারা তাঁর প্রতি করুণা বোধ করেন এবং তাঁরা তাঁকে বাড়িতে গিয়ে

বাড়িতে ৮টি দোলনা স্থাপন করতে বলেন। রাতে সাতটি স্ত্রী সাপ এবং একটি পুরুষ সাপ ঘরে প্রবেশ করে এবং শিশুতে রূপান্তরিত হয়। রাজা তাদের নিজের সন্তান হিসাবে লালন-পালন করেন। মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের পূজা করা হয় এবং তাঁদের নাগ বংশোদ্ভূততা বোঝাতে একটি সাপের ফণার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সাতটি মূর্তির একটি দল হিসাবে চিত্রিত করা হয়।

গোয়া

'গোয়ায়, সাত বোন কোলবাই, মহামায়া, লাইরাই, মীরাবাই , মরজাই, শীতলাই, আদদীপা - এবং তাঁদের ভাই খেতোবা নামে পরিচিত, যিনি ক্ষেত্রপালের একটি রূপ, বীরভদ্রের একটি রূপ। গোয়ার লোক সংস্কৃতি গবেষক, বিনায়ক খেদেকর এটিকে সপ্তমাত্রিকা নামে পূজিত প্লিয়েডস গোষ্ঠীর পূজা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। খেদেকর বলেন, 'গোয়ায়, তাদের কাত্যো নামক একটি বিশেষ উৎসবে পূজা করা হয়।'[৬]

গল্প অনুসারে, সাত বোন এবং তাঁদের ভাই খেতোবা, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে একটি হাতিতে চড়ে গোয়ার বিচোলিমে একটি বাড়ির খোঁজে যাত্রা করেছিলেন। দেবী শান্তাদুর্গা ইতিমধ্যেই বিচোলিমে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি তাঁদের কাছের মায়েম গ্রামে পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তাঁরা বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

একদিন খেতোবাকে খাবার রান্নার জন্য আগুনের ব্যবস্থা করতে বলা হল। যখন সে ফিরে না এলো, তখন চিন্তিত হয়ে লাইরাই তাকে খুঁজতে গেল এবং দেখতে পেল যে সে বন্ধুদের সাথে খেলছে। রেগে গিয়ে তার ভাইকে লাথি মারল এবং সে তার পিঠ মুচড়ে দিল। কোলবাই যখন জানতে পারল যে কী ঘটেছে, তখন সে লাইরাইকে ধমক দিল, যিনি বাড়ি ছেড়ে শিরগাওতে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু তিনি প্রতি বছর ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি আগুনে খালি পায়ে হাঁটবেন, যা তাঁর ভক্তরা মে মাসে তাঁর মন্দিরে একটি উৎসবে পালন করেন। লাইরাইয়ের প্রিয় বোন মীরাবাই, যার মাপুসার মন্দিরকে জোর করে একটি গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল যেখানে পর্তুগিজরা আসার পর তাঁকে মিলাগ্রেস সাইবিন বা মাদার মেরির একটি সংস্করণ হিসেবে পূজা করা হয়। আজও, মীরাবাই হিন্দু এবং খ্রিস্টান উভয়ের দ্বারাই পূজা করা হয়।

লাইরাইয়ের কোনও মূর্তি নেই, এবং মন্দিরের পুকুরের জলে ভরা একটি পাত্র দ্বারা এটি প্রতিনিধিত্ব করা হয় যার ভিতরে একটি মোগরার কুঁড়ি রয়েছে, যা গর্ভের ভিতরে একটি ভ্রূণকে নির্দেশ করে। মোরজাই মরজিমে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মহামায়া মায়েমে বসতি স্থাপন করেছিলেন, আর কোলবাই মুলগাঁওয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। লোকে বিশ্বাস করে যে আদদীপা অঞ্জদ্বীপ নামক একটি দ্বীপে চলে গিয়েছিলেন এবং সিতলাই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নিম্নাঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন

মজার ব্যাপার হলো, গোয়ায়, একজন হিন্দু দেবীকে মাদার মেরির রূপে রূপান্তরিত করা সত্ত্বেও, তিনি সাত বোনের একজন হিসেবে তার আসল পরিচয় এবং অবস্থান হারাননি এবং প্রাক-পর্তুগিজ রীতিনীতিতে তাঁর স্থান হারাননি যা সাত বোনের গল্প উদযাপন করা হয়।

মহারাষ্ট্র

মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণ অঞ্চলে, সাত বোনকে চম্পাবতী, শীতলা, একবীরা, পদ্মাবতী, কলালাগী, হিঙ্গুলজা এবং চতুর্সিটি নামে পূজা করা হয়। চম্পাবতীকে জ্যেষ্ঠ বোন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাঁকে চৌল গ্রামের প্রধান গ্রামদেবতা বলা হয়।

সকল বোনের মধ্যে হিঙ্গুলজাকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। গ্রামবাসীরা হিঙ্গুলজার নামে একটি বিশেষ যাত্রা উদযাপন করে। গ্রামে সমস্ত দেবীর আলাদা আলাদা নিজস্ব মন্দির রয়েছে, তবে তাঁরা একসাথে বোন হিসেবেও পূজিত হন।

মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অংশে, সপ্ত দেবীকে কেবল সৎ আসর হিসাবে পূজা করা হয় এবং তাঁদেরকে স্রোত এবং নদীর মতো জলের উৎসের রক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটি ঝর্ণা বা নদীর কাছে একটি গাছের নীচে স্থাপন করা সাতটি সিঁদুর পরিহিত পাথর হিসাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব ।

মুম্বাইয়ের কোলিরা বা জেলে সম্প্রদায় সাত দেবী মুম্বাদেবী, চণ্ডিকা দেবী, মহালক্ষ্মী, শীতলমাতা, কালবাদেবী, জারি মারি, চেদা দেবী এবং তাদের ভাই মহসোবার পূজা করে। আজকের মুম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের সকলের নিজস্ব মন্দির রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট দিনে কোলিদের পূজার প্রথম অধিকার রয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু

সাত বোন দেবীকে তামিলনাড়ুতে পোলেরাম্মা, আঙ্কাম্মা, মুথ্যালাম্মা, দিল্লি পোলাসি, বাঙ্গারাম্মা, মাথাম্মা এবং রেণুকা হিসাবে পূজা করা হয়। তেলেঙ্গানা- অন্ধ্রপ্রদেশে সাত বোন পেদ্দম্মা ইসোদ্দম্মা, মারিয়াম্মা, আঙ্কলাম্মা, ইল্লাম্মা, নকুল্লাম্মা

এবং আরিক্কাম্মা নামে পরিচিত। মাজার সাধারণত গ্রামের সীমানার বাইরে অবস্থিত। এগুলিকে প্রায়শই একটি গাছের নীচে রাখা সাধারণ পাথর হিসাবে পূজা করা হয়, কোন স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই।

তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চলে পোলেরাম্মাকে গুটিবসন্তের দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি সম্প্রদায়ের মানুষ এবং প্রাণীদের স্বাস্থ্যের জন্যও দায়ী বলে বিবেচিত হন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষাকারী হিসাবে পূজিত হন। গ্রাম বাংলার দেবী শীতলতার সাথে যথেষ্ট অনুরূপতা লক্ষ্য করা যায়।

অঙ্কম্মাকে গৃহদেবী হিসেবেও পূজা করা হয় যেখানে তিনি একটি পাত্র দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেন যার মধ্যে কিছু খোলস, ছোট মাটির মগ এবং অন্যান্য অনুরূপ জিনিসপত্র থাকে। খোলসগুলি শয়তানের দাঁতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পাত্রগুলি সেই খাবারের প্রতিনিধিত্ব করে যা তাঁরা আকাঙ্ক্ষিত করেন।

রেণুকা হলেন ধরিত্রী মাতার এক প্রকাশ, এবং কখনও কখনও জীবন্ত পিঁপড়ের স্তূপের আকারেও পূজিত হন। রেণুকাকে সাত বোনের দেবতার অংশ হিসেবে এবং স্বতন্ত্র দেবী হিসেবেও পূজা করা হয়। উপদ্বীপীয় ভারতে তিনি ব্যাপকভাবে পূজিত হন এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন মহাঙ্কলি, যোগাম্মা, সোমলাম্মা এবং রেণুকাম্বা।

ওড়িশা

ওড়িশায়, সপ্ত দেবীকে সম্মিলিতভাবে সাতবাহেণী ("সাত বোন") বলা হয় । বিশ্বাস করা হয় যে এই সপ্ত দেবী বিখ্যাত তান্ত্রিক রাজকন্যা লক্ষ্মীঙ্করের অনুসারী ছিলেন। বিশ্বাস করা হয় যে তাঁরা নিম্ন বংশের হলেও মহান তান্ত্রিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। আজও পুরীতে তাদের পূজা করা হয়।

তাঁদের নাম হলো নিতেই ধোবানি, জ্ঞানদেয়ী মালুনি, গাঙ্গী গৌড়ুনি, সুয়া তেলুনি, লুহুকুতি লুহুরানি, সুকুতি চামারুনি এবং পাত্রপিন্ধি সাহারুনী। তাঁদের পদবি অনুসারে, তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বতন্ত্র পেশার কর্মজীবী মহিলা, নিতেন ছিলেন একজন ধোপা, জ্ঞানদেয়ী ছিলেন একজন মালা তৈরির কারিগর, সুয়া ছিলেন একজন তেল উত্তোলনকারী, গাঙ্গী ছিলেন একজন গুড় তৈরির কারিগর, লুহুকুতি ছিলেন একজন লৌহশিল্পী, সুকুতি ছিলেন একজন জুতা তৈরির কারিগর ইত্যাদি। দের সকলের নিজস্ব আলাদা গল্প রয়েছে।

জাজপুরে সপ্তমাতৃকাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি পৃথক মন্দিরও রয়েছে , যেখানে কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তিগুলির সাথে মাতৃকাদের ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিফলিত করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলা এবং ছোট বাচ্চাদের মায়েরা তাদের পূজা করেন। সপ্তমাতৃকাদেরও যোগিনীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে , যা ওড়িশার চৌষট্টি বা একাশি জন

তান্ত্রিক দেবীর একটি দল। ওড়িশায় ৬৪ জন যোগিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুটি মন্দির রয়েছে, একটি হীরাপুরে এবং অন্যটি রানিপুরে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ ও পশ্চিম থেকে পূর্বে সপ্তমাতৃকার বিবর্তন

বাংলার মাটি উৎসগতভাবে বড়ই মিস্টি যা তার চীরন্তন বৈশিষ্ট্য

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের যতগুলো ঘরানা আছে তার মধ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানার ভঙ্গিমা বেশ পৃথকীকৃত।আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরের মিস্টত্বের দিক দিয়ে এর শৈলী অন্যান্য ঘরানাকে হার মানায়।

সার্বিকভাবে বাংলার সংস্কৃতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে।যেমন বলা যায়

ক.সমগ্র ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির ক্ষুদ্র রূপ

খ. সারল্য

গ.ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান প্রধানত পশ্চিমাঞ্চল অনেক বেশি বাস্তব কে প্রকাশ করে যত পূর্বে আসা হয় তার মধ্যে ভাবের প্রয়োগ করতে থাকে ।

এক্ষেত্রে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি।

দেখা যাচ্ছে রাজস্থান গুজরাট অঞ্চলে শক্ত ভগিনী রাজা রানীদেরই যেন প্রতিভু।লৌকিক স্তরে যত পুড়বে আসছেন এই সপ্তমাতৃকার মধ্যে দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে।ঝাড়গ্রামে ডুলুম নদীর তীরে যে সপ্তমাতৃকা আছেন তারা হলেন এক রাজার সাত রানী।মনে করা হয় তারা আবার রাজপ্রাসাদের সাতজন রক্ষকও।দেখা যাচ্ছে বাস্তবিক রুপেরই দেবত্ব প্রাপ্তি ঘটছে।আবার দাঁতনের তররুই বা জ্যোতিদুবেরিয়া গ্রামে দেবী শক্ত ভোগিনী হিসেবে পূজিত হলেও পৃথকভাবে সাতটা পাথর পূজা করার কোন সংস্কৃতি নেই।এখানে দেবী পুজো হচ্ছেন কেবলমাত্র একটি ধারণা রূপে।এক্ষেত্রে দেবীর মধ্যে একটি আদিম ও বন্য ভাব প্রকাশিত।তাই তার কোন রূপ নেই।কিন্তু আমরা যদি দাতুনের ওই রুক্ষ পাথরে পরিবেশ থেকে পেরিয়ে এসে খানিকটা উপকূলবর্তী নরম মাটির অঞ্চলে প্রবেশ করি তাহলে দেখব দেবী আকৃতি পেয়েছেন।দাঁতন-ঝার গ্রামের গভীর জঙ্গল থেকে উঠে ধীরে ধীরে দেবী যখন হাড় খেজুরি, বেলদা ইত্যাদি গ্রামে প্রবেশ করেছেন তার মধ্যে ওই বন্য উগ্র প্রকাশভঙ্গি বা অনেক কমে গেছে।আমাদের আলোচনার মূল জায়গা এটাই।এবং এরকমই একটা উপকূলীয় গ্রামকে নিয়ে যেখানে জঙ্গল এবং উপকূলের নরম ভাব দুটোর সংমিশ্রণ চোখে পড়ে।আবার সুন্দরবনের বন্যা প্রবণ,প্রাকৃতিক দুর্যোগ যুক্ত অঞ্চলে দেবী সন্তানের রক্ষক হিসেবে বিরাজ করছেন।

মৈতনাগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-

“ মৈতনা গ্রামটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর ২নম্বর ব্লকের মৈতনা গ্রাম- পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম। ড. নরেশ নন্দ মশাই তাঁর বইতে বলেছেন মৈতনা = মা + এতা+ না। বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় মা = লক্ষ্মী, আ+ইত = এত (প্রাপ্ত), না = পুরুষ, অর্থাৎ যে গ্রামের পুরুষগণ শ্রীমান। আবার অনেকের মতে মৈত না = মা + এতনা (দুঃখ)। অর্থাৎ দুঃখ নেই যে গ্রামে।“[১]

সব মিলিয়ে বলা যায় গ্রামটি সম্ভ্রান্ত পুরুষদের বসবাসযোগ্য একটি পরিকল্পিত গ্রাম। গ্রামটি প্রধানত ব্রাহ্মণ পাড়ায় পরিমন্ডিত একটি গ্রাম। নন্দ, মিশ্র, কর, রায়(উপাধি প্রাপ্ত), বড় পন্ডা, পানিগ্রাহী ইত্যাদি উৎকলী ব্রাহ্মণদের নিয়েই গ্রামটি গঠিত। অব্রাহ্মণ কিছু পরিবার থাকলেও ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য বেশি। এই গ্রামে মোট ৪২৩টি পরিবার বসবাস করে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, নিজ মৈতনা গ্রামের মোট জনসংখ্যা ১,৯৩৭ জন, যার মধ্যে ১,০০৪ জন পুরুষ এবং ৯৩৩ জন মহিলা।

মৈতনা গ্রামে ০-৬ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা ১৯০ জন, যা মোট জনসংখ্যার ৯.৮১%। গ্রামের গড় লিঙ্গানুপাত ৯২৯, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গড় ৯৫০-এর চেয়ে কম। শিশু লিঙ্গানুপাত (০-৬ বছর বয়সে) ৮২৭, যা রাজ্যের গড় ৯৫৬-এর তুলনায় কম।

মৈতনা গ্রামে সাক্ষরতার হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি। ২০১১ সালে এই গ্রামের সাক্ষরতার হার ছিল ৯৩.৫৩%, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় সাক্ষরতার হার ছিল ৭৬.২৬%। নিজ মৈথুনা গ্রামে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ছিল ৯৭.৬৭% এবং মহিলাদের ছিল ৮৯.১৪%।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য গ্রামের থেকে মৈতনা সার্বিক ভাবে একটি উন্নত গ্রাম।

মৈতনাগ্রামে পূজিত সপ্তমাতৃকার উৎপত্তি ও কিম্বদন্তি

ক. প্রধান পুরোহিত অনন্ত করের বিবৃতি-প্রায় আড়াইশো বছর আগের ঘটনা।বাসদেবপুরের রাজা ছিলেন দুর্গা দাস রায়।এই বৃহৎ মন্ত্রণা ছিল তাঁর সংগ্রহের এলাকাভুক্ত এবং প্রধানত এখানেই ছিল রাজার বাগানবাড়ি।প্রাচীনকালে রাজারা যেমন মৃগয়ায় যেতেন তেমনি জমিদার দুর্গা বাবুর সময় কাটানোর স্থান ছিল এই অঞ্চল।জায়গাটির নাম ছিল রাজা বাগিচা।বর্তমান মিশ্র পাড়ায় ছিল জমিদারের বাগানবাড়ি।জঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চলে থাকতো রয়েল বেঙ্গল

টাইগার।বাঘ শিকারে আসেন জমিদার। রাত্রি বাস করেন তার বাগান বাড়িতে। ভোররাতে স্বপ্ন পান সপ্ত ভগিনীর ঘুম ভেঙে রাজা দেখেন সামনে রাখা আছে সাতটি ঘট। স্বপ্নে ৭ দেবীর নির্দেশে প্রতিষ্ঠা করেন সাতটি ঘট।ধানের সংলগ্ন নন্দ পরিবারকে দিয়ে যান সেবায়েতের দায়িত্ব।পূজার ভার দিয়ে যান কর পরিবারকে।রাজা স্বপ্নে পান এক বিশেষ স্বপ্ন মন্ত্র যা পুরোহিত পরিবারকে দিয়ে যান এবং নির্দেশ অনুযায়ী তা অন্য কাউকে বলা যায় না।

স্বপ্ন নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমান মন্দিরের পূর্বে খননকার্য চালিয়ে এক চণ্ডী মূর্তি পাওয়া যায়।এই চণ্ডী মূর্তিকে মাঝে রেখে বটগাছের তলায় এক বালির উঁচু ঢিপি তৈরি করে সাতটি ঘট বসিয়ে দেবীর ধানের প্রতিষ্ঠা করেন জমিদার।ওই চণ্ডী মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় একটি খড়গো যা বলীর জন্য ব্যবহার হতো।

জেবির আদি স্থান ছিল বর্তমান থানের থেকে খানিকটা দূরে কামিলা পাড়ায়।৪৯ সালে প্রচন্ড বন্যাও ঝড়ের ফলে তুলে এনে এই অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই নিমগাছ ঝড়ের ফলে ভেঙ্গে গেলে বকুল গাছের তলায় দেবিকে স্থাপিত করা হয়।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আলোচনা

‘দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে প্রচন্ড ভুআলোড়ন ও সমুদ্রের বালি জমে জমে এই অঞ্চলের বালু ওয়াড়ি যুক্ত ভূমি গড়ে ওঠে। তখন এই অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ।গভীর জঙ্গল থাকলেও জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছিল বড় বড় মিষ্টি জলের হ্রদ। সমুদ্র উপকূলীয় স্থানের থেকে এই অঞ্চল ছিল যথেষ্ট উর্বর।ফলে সমুদ্র উপকূলীয় এবং উড়িষ্যার গভীর অনুর্বর অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে মানব-পরিযান ঘটে।যা হয় গোষ্ঠী ভিত্তিতে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে এই গোষ্ঠী ছিল প্রধানত অস্ট্রিক।এই পদ্ধতি ছাড়াও আর এক ভাবে গোষ্ঠীর আগমন ঘটে।’**৩** পাঠান আক্রমণের সময়, পাঠানদের যুদ্ধ হয় তৎকালীন উড়িষ্যার সঙ্গে।রাজা সৈন উড়িষ্যার গভীর জঙ্গল থেকে।এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন কাঁটরা ও ডোম জাতির লোক।তাদের পুঁজিটা দেবীর দেন এই সপ্তভগিনী।বর্তমান থানের মাটির কলসিগুলি অনেক পরে আনা হয়েছে।আগে কেবল সাতটি পাথরই পূজিত হতো।যাদের স্থান ছিল উত্তর মৈতনায়।এই অনার্য গোষ্ঠীর পরে এই অঞ্চলে পা পড়ে ব্রাহ্মণদের।ব্রাহ্মণরাই ওই সাতটি পাথর জঙ্গলের মধ্যে পান।তাদের প্রতিপত্তি বেশি হওয়ায় তারা পূজার ভার অব্রাহ্মমণ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর হাত থেকে কেড়ে নেন।এর ফলেই সাত বোন চলে আসেন ব্রাহ্মণদের অধিকারী।গ্রামের দায়িত্ব আসে ব্রাহ্মণদের হাতে।এই ব্রাহ্মণদেরও বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী বর্তমান ছিল।নন্দ পদবীর ব্রাহ্মণরা প্রধানত শিক্ষাদিক্ষা এবং পূজা পাঠ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।হোলি এই অধিকার যায় নন্দদের হাতে।নন্দরা হয়ে ওঠেন দেবীর সেবায়েত।কিন্তু নন্দুরা উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ।সাত বোনের দায়িত্ব তাদের হাতে গেলেও যাত্রা অভিমানের কারণে সাত বোনকে তারা নিজেদের করে নিতে পারেননি। ফলে পূজার ভার পড়ল পতিত ব্রাহ্মণ

করদের ওপর।পরিবেশ এবং ভূপ্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটে।তাদের মধ্যে সেই আদিমতা আর থাকে না। চণ্ডী মূর্তিটি অনেক পরবর্তীকালের সংগ্রহ মুক্তির ষষ্ঠ শতকের পরে তৈরি হতে শুরু হয় তাই এই চণ্ডী সঙ্গে সাত বোনের সংযোগ থাকলেও মূর্তিটি সাতটি পাথর পূজিত কালের প্রতিষ্ঠিত নয়।

শীতলা, চণ্ডি ও মঙ্গলার সঙ্গে সপ্তমাতৃকার সম্পর্ক

তাত্ত্বিকদের মতে মেদিনীপুর উৎকল সংলগ্ন ওই অঞ্চলে চণ্ডি এবং শীতলা কোথায় যেন অভিন্ন। আবার শব্দ ভগিনী যে ৭ গন্ধের মধ্যে চণ্ডি হলেন প্রধান বা অন্যতম।আবার শীতলার সঙ্গে চণ্ডির সম্পর্ক থাকায় এই সাত বোনের সঙ্গে শীতলা এসে মিলিত হয়েছেন।প্রাচীনকাল থেকেই গুটি বসন্তের দেবী হিসেবে শীতলা প্রসিদ্ধ।তারপর যখন কলেরার প্রকোপ বাড়ে।

ওই অঞ্চলে দেবী চণ্ডিকে করে তোলা হয় কলেরার দেবী। আবার এই ৭ বোনের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ বিষয়টিও সম্পর্কে যুক্ত। সন্তান কামনার জন্য বাড়ির মায়েরা ধর্মের কাছে পূজা দেন।স্থানীয় গবেষক অরবিন্দ মাইতির মতে শীতলা হলেন বৌদ্ধদেবী।বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে শীতলা সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।সেদিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে শীতলা হয়ে ওঠেন সন্তান কামনার দেবী।এই বিষয়টির সঙ্গেও সপ্ত ভগিনীর মিল পাওয়া যায়।তাই মন্ত্রণা সংলগ্ন শীতলপুর গ্রামের শীতলা একক থাকলেও সপ্তভগিনী রূপেই পূজিত হন।ওই অঞ্চলে পতিত হন গ্রামের স্থানীয় দেবী মঙ্গলা।যিনি চণ্ডীরই আর এক বিশেষ রূপভেদ।গবেষক দীপঙ্কর দাস তার বইতে লিখেছেন-

এই মঙ্গলা হলেন গবাদি পশুর রক্ষক দেবী।আবার কোন কোন অঞ্চলে শক্ত ভগিনী পূজিত হন গবাদি পশুর রক্ষক হিসেবে।যা চাতড়াবুড়ির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।‘Mangala means benevolent but sacrifice of goat and buffalo’[২] এর ফলেই মৈতনা গ্রামের ওই নির্দিষ্ট স্থানে সাত জন দেবী প্রতিষ্ঠিত হলেও মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলির মত তাদের আদি উৎস ৭ জায়গায়।যা আবার ইসলামীয় মতে সাত বিবির সঙ্গে মিল যুক্ত। এর থেকে বলা যায় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী গুলি ওই সাত যায়গায় বিস্তার লাভ করে।

উপসংহার

লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে বিষয়টা উঠে এলো তা হল বিজোড় সংখ্যায় পূজা পদ্ধতি।এই পদ্ধতি মেনে চললে মাঝখানে একটি পাথর রেখে দুপাশে জোর সংখ্যায় পাথর থাকবে।

এ যেন প্রকাশ করছি একজন গ্রাম প্রধান বা মোড়ল গ্রামের জনগণকে নিয়ে গ্রাম শাসন করছেন।এই বিষয়টি আমরা আরো বেশ কিছু জায়গায় বিজোড়ভাবে পূজিত অনার্য দেবদেবীকে দেখতে পাই। কিন্তু মৈতনা গ্রামের এই সাত ভগিনীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টির বিঘ্ন ঘটেছে।দেখা যাচ্ছে এক দিকে তিনটি কলসি আর একদিকে চারটি।এই বিষয়টি প্রকাশ করে অনার্য সংস্কৃতির ওপরে আর্য সংস্কৃতির জোর করে হস্তক্ষেপ।এ যেন ইতিহাসেরই চিত্ররূপ।

আবার জগন্নাথ মূর্তি নীলমাধব থেকে যেভাবে উদ্ভূত হয়েছেন,ঠিক সেই ভাবেই শক্ত ভগিনীর আখ্যানও আখ্যায়িত হয়েছে।যা আমরা ওই অঞ্চলে প্রচলিত 'বাগাম্বরের বংশ উদ্ধার' পালায় খুঁজে পাই এবং সবশেষে বলা যায় চণ্ডি ,শীতলা, মনসা ,ধর্ম এই সকল দেবতা জন্ম থেকে অবৈদিক হলেও পরবর্তীকালে তারা বৈদিক দেব-দেবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ লাভ করেছেন।কিন্তু শব্দ ভগিনীর উৎস টাই যেন মিশ্রণের।হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া শব্দ ভগিনীর সিল্ডকে তাত্ত্বিকরা প্রকাশ করেছেন শীতলার বোন হিসেবে।গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু দেখিয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক দেবী ছাদের ধারণার মধ্যে প্রবেশ করছেন।তাই বলা যায় একটা ধারণা যখন লৌকিক দেবীদের রূপের রূপায়িত হন

তার মধ্যে প্রবেশ করে অসীম বৈচিত্র্য।সুদূর সিন্ধু উপত্যকায় দেবী রূপে যার উৎপত্তি সীমান্ত বাংলার একটি গ্রামে বোন রূপে সমস্ত শ্রেণির মানুষের কাছে বড়োই আপন হয়ে উঠেছেন।

চিত্র ১: মৈতনাগ্রামে অবস্থিত সপ্তভগিনী

চিত্র ২: সাত বোনের দ্বারা প্রদত্ত স্বপ্নে প্রাপ্ত বলির খড়্গ

চিত্র ৩: দাঁতনের জ্যোতিদুবেড়িয়ায় সপ্তভগিনীর থান

চিত্র ৪: দাঁতনের তড়ডুইতে প্রাপ্ত চণ্ডি ও সপ্ত ভগিনীর সহাবস্থান

চিত্র ৫: সপ্তভগিনী রূপে পূজা প্রাপ্ত শীতলা

চিত্র ৬: সপ্তভগিনী ও চণ্ডির পূজা সাদৃশ্য

চিত্র ৭: হরপ্পায় প্রাপ্ত সপ্তভগিনীর শিল্ড

চিত্র ৮: লৌকিক দেবদেবীর বীজোড় সংখ্যায় অবস্থান ও সজ্জাগত সাযুজ্য

চিত্র ৯: অবস্থানগত সজ্জায় কর্তৃত্বের ছাপ

চিত্র ১০: দাঁতনের জ্যোতিদুবেড়িয়ায় সপ্তভগিনীর সেবায়েত পাত্র পরিবার: অস্ট্রিক প্রভাব প্রকট

তথ্যসূত্র

১. দীপককুমার বড়পণ্ডা, শিল্প সংস্কৃতির সন্ধানে বাংলার গ্রাম অন্য চোখে, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা ০৭, ২০১৯, পৃ: ১৩৯

২. FOLK &REGIONAL GODS & GODDESSES OF MEDINIPUR; Dipankar Das; Arindam's publication(2022),Midnapur 721101, পৃ: ৮৩

৩. বাঙালি জাতির ইতিহাস, নাসির আলি; আনন্দ প্রকাশন (2024) পৃ: ৫৬

৪. গ্রাম দেবতা সাত ভউণি প্রসঙ্গ; মন্মথ গড়াই, মনন পত্রিকা সংখ্যা ২০, পৃ: ২৫

৫. বাংলার লৌকিক দেবদেবী ; গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু; দেজ পাবলিকেশন(1969), পৃ: ১০

৬. Shefali Vaidya,:"The Seven Sister Goddesses", INDICA TODAY, November 30, 2023

৭. ‘Studies in Goddess Cults in Northern India’; Jagadish Narayan Tiwari, Sandeep Prakasn, পৃ: ১৩৫

৮. 'দ্য সেভেন সিস্টার্স অফ দ্য প্লিয়েডস: স্টোরিজ ফ্রম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' পিনিক্স প্রেস, পৃ: ১৪৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. দীপককুমার বড়পণ্ডা, শিল্প সংস্কৃতির সন্ধানে বাংলার গ্রাম অন্য চোখে, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা ০৭, ২০১৯

২. Dipankar Das, FOLK & REGIONAL GODS & GODDESSES OF MEDINIPUR; Arindam's publication, 2022

৩. বাঙালি জাতির ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তন, নাসির আলি, আনন্দ প্রকাশন, ২০২৪

৪. গ্রাম দেবতা সাত ভউণি প্রসঙ্গ, মন্মথ গড়াই

৫. গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবদেবী, দেজ পাবলিকেশন ১৯৬৯

৬. Shefali Vaidya,:"The Seven Sister Goddesses", INDICA TODAY, November 30, 2023

বিচ্ছিন্ন ঘোড়ার একাকিত্ব: *হেষা ক্রন্দনে কাঁথা থেকে পুতুল*

❖ কাঁথা শিল্প

যশোরের ঘরে ঘরে সেদিন মেয়েরা বসেছেন ছুঁচসুতো হাতে কাপড়ের উপর নকশা করতে। তৈরি হয়ে উঠবে কাঁথা। নানান চিত্রকল্পে মন্ডিত এই কাঁথাই হয়ে উঠে ছিল যেমন ঠান্ডা থেকে রাক্ষা পাওয়ার সামগ্রী তেমনি গ্রাম্য বধূদের হৃদয় অনুভূতি প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। এভাবেই কাঁথা প্রাত্যহিক ব্যবহার্য বস্তু থেকে হয়ে উঠেছে গোষ্ঠী চেতনার দলিল।

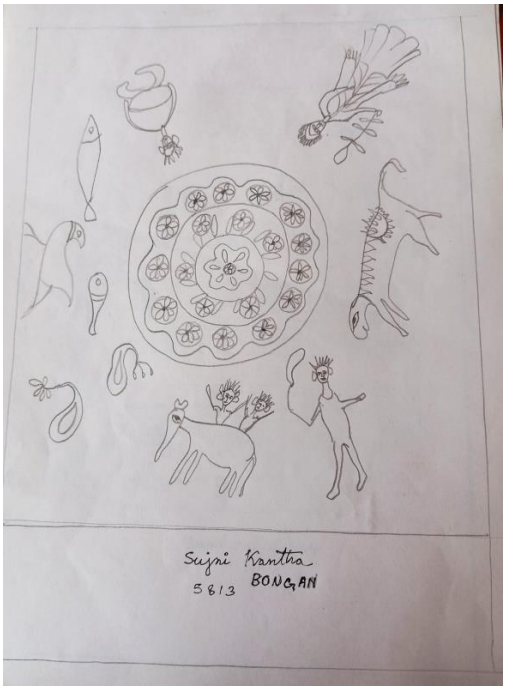

আলচ্য কাঁথাটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি চিত্র। যার সমষ্টিবদ্ধ রূপ জমিদার শাসিত বাংলার গ্রামের চিত্রকল্পকে প্রকাশ করছে। কাঁথাটিতে একটি গ্রামের ছবি ফুটে উঠছে। যেখানে এক বাবু গোছের জমিদারকে দেখা যাচ্ছে, যাঁর অধীনে অন্যান্য চরিত্র কাজকর্ম করে চলেছে। ঘোড়ার পিঠে কিছু ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে

যারা সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান করছে। এই গোষ্ঠী তৎকালীন জমিদারী সামন্ত্রতন্ত্রে এক বিশেষ উপদান। এরাই তৎকালীন বঙ্গদেশের ডোম। এই ডোমেরা ছিল যুদ্ধে পারদর্শী প্রধানত জঙ্গলে বসবাসকারী গোষ্ঠী। জমিদার ও রাজারা যুদ্ধে পারদর্শিতার কারনে এদের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করেন। কেবল বাংলার ক্ষেত্রে নয় উড়িষ্যার রায়বনীয়া দূর্গের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উৎকল রাজন্যবর্গ উড়িষ্যা- ঝাড়খন্ডের গভীর জঙ্গল থেকে এই জনগোষ্ঠীকে আনেন। কেবল চিত্র নয় সাহিত্যের মধ্যেও আমরা এই বিষয়টি খুঁজে পাই।

" আগডুম বাগডুম ঘোড়া ডুম সাজে"

এই ছড়ায়, এখানে ডুম হল ডোম। অর্থাৎ আগে ডোম, পাশে ডোম এবং ঘোড়ায় ডোম সেজেছে।

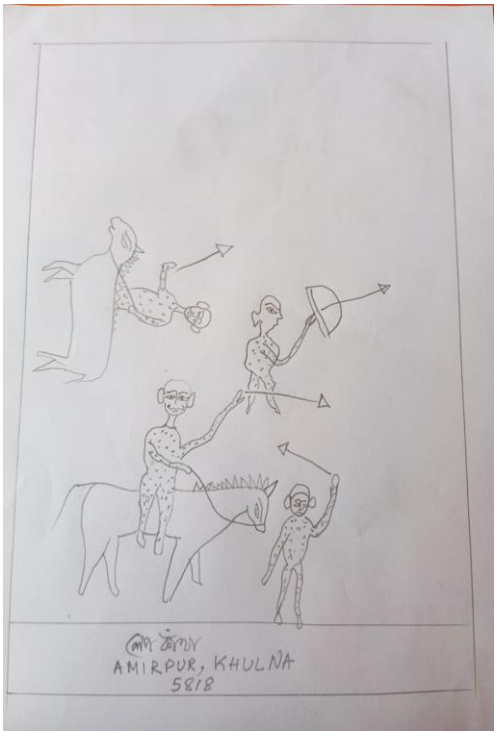

এই কাঁথাটিতে এই রণসজ্জার বিবরণই আখ্যায়িত হয়েছে। যাতে প্রধানত এই ছড়াটির বিষয়বস্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। আগের কাঁথায় সীমান্তরক্ষায় যাদের দেখা গেছিল তারা এখানে যুদ্ধরত সৈনিক। এই দুটি কাঁথার চিত্রকল্পের তুলনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি এই গোষ্ঠীর কাজই হল প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ।

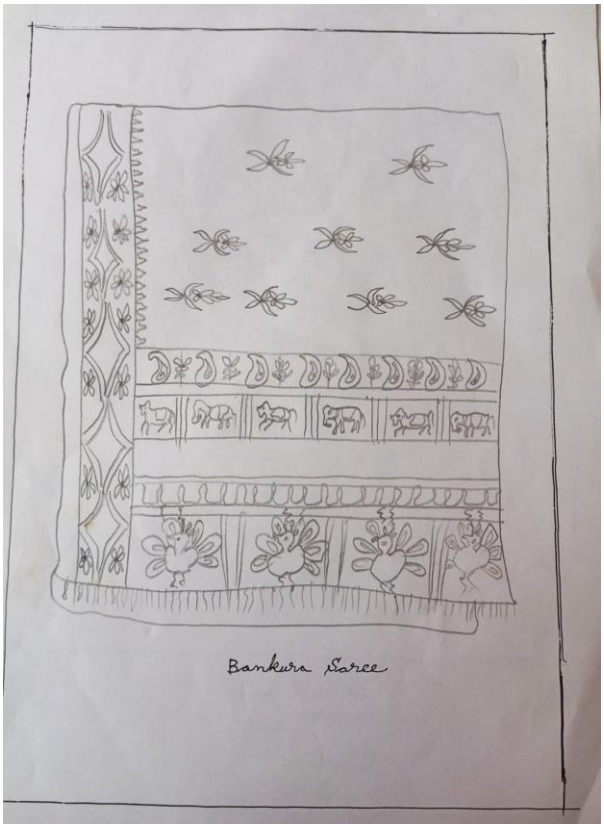

এই ধারাই শাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। শাড়িতে ফুটে উঠল অনুভূমিক ভাবে হাতি ঘোড়ার ক্রমিক প্যানেল।

- **কাঁথা ও শাড়ির পার্থক্য:**

কাঁথা প্রধানত গৃহ বধূদের হৃদয় অনুভূতির এক প্রকাশ মাধ্যম। যেখানে এক কোমল প্রাণের স্পর্শ আছে। কিন্তু শাড়ি ওইভাবে একসঙ্গে বসে হাতে বোনা নয়। শাড়ি তাঁতের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে।

❖ পার্থক্যের কারণ:

ক.এক্ষেত্রে কাঁথার মতো ময়ুর, হাতি, ঘোড়া সবই আছে। কিন্তু কোথায় যেন যান্ত্রিক ছাপ এসেছে। উপরন্তু কাঁথা বাড়ির মধ্যে রাতে গায়ে দিয়ে ঘুমনর সামগ্রী কিন্তু শাড়ি জনসমক্ষে পরার সামগ্রী। তাই শাড়ি অনেক নিখুঁত হয়েছে ।

খ. দলবদ্ধ ভাবে মেয়েদের হাতে তৈরি হওয়ায় কাঁথায় বাংলার প্রকৃতি অনেক বেশি প্রাকৃতিক। সেখানে লতাপাতা, লতাপাতাই আছে । কিন্তু শাড়িতে তা আলপনার রূপ নিয়েছে। তাই হাতি ঘোড়াও এখানে নক্সা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ভাবেই জমিদার ও রাজন্যবর্গের বীরত্ব ও আভিজাত্যের প্রতিক হয়ে উঠল ঘোড়া।

❖ বাঁকুড়ার শাড়ি

এখানে কাঁথার ছবিরই নক্সাজাত রূপ ফুটে উঠেছে। ঘোড়া, হাতি এবং লতাপাতা সবই নক্সা রাপে বিদ্যমান। জমিদারের জমিদারিও নেই আবার যুদ্ধের ছবিও নেই। কেবল

আভিজাত্যই প্রকাশ পেয়েছে। যা আলপনার রূপ নিচ্ছে। মাধ্যম এবং সময়ের ক্রম পরিবর্তনে এ যেন এক প্রকার অনুবাদ।

❖ মাটির পুতুল

তাহলে শাড়িতে দেখা গেল ঘোড়া সৈনিক হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধারাটাই আমরা পুতুলে দেখতে পাব। যেখানে শাড়ির আভিজাত্যময় নক্সাযুক্ত দ্বিমাত্রিক ঘোড়াই রূপ নিয়েছে ত্রিমাত্রিকতায়।

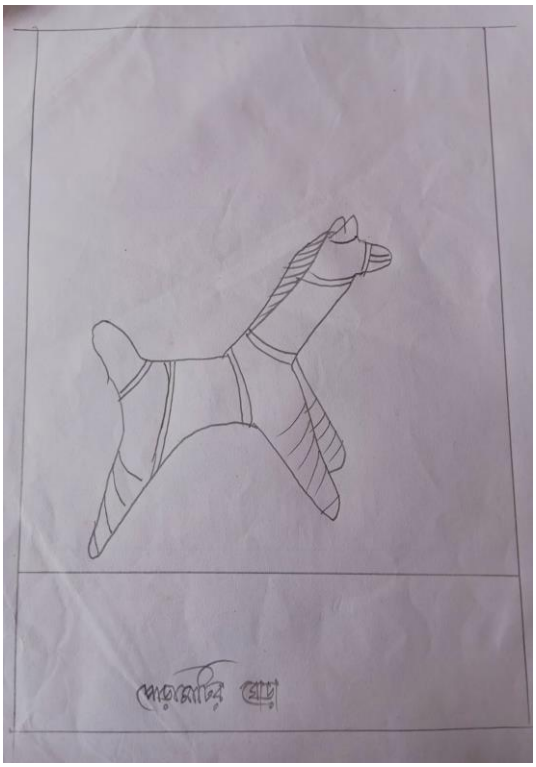

এই ঘোড়ার সঙ্গে আর সারিবদ্ধভাবে হাতি নেই অন্য ঘোড়াও নেই। দলবদ্ধ ডোম সৈনিকের ঘোড়ারও আজ দলছুট। একই ভাবে ডোমরাও আজ সেনাবাহিনীতে কাজ করেন না।

তাঁরা মিসে গেছেন বৃহৎ বঙ্গসমাজের বুকে। তারপর সময় যত গড়িয়েছে ওই নিসঙ্গ ঘোড়া স্থান পেয়েছে ধর্মের থানে। আজ আর সেই ঘোড়া দলবদ্ধ ভাবে ডোম সৈনিককে পিঠে চড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়ায় না। ড়াঢ় বঙ্গের গ্রামে গ্রামে আজ বট গাছের তলায়, ধর্মের থানে তার নিঃসঙ্গ হ্রোষাধ্বনি বাংলার দুপুরকে আরও নির্জন করে তোলে।

টেরাকোটা ও পাটাচিত্র

- **মন্দিরের টেরাকোটা**

এই টেরাকোটাটিতে দেশীয় চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে দেখাযাচ্ছে একজন উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের নারী আভিজাত্যমূলক ভঙ্গিমায় বসে আছেন। তাঁর চার দিকেচার জন নারী তাঁকে ঘিরে রেখেছেন ও আবিষ্ট করে চলেছেন। এই পাঁচজন দেবীয় মানুষ। এমনকি মাঝখানে অবস্থান করা নারীও তাই। কিন্তু তাঁর পোশাক ও হাবভাবের মধ্যে পাশ্চাত্যের ভঙ্গিমা আছে। এই নারীর বেশভূষার শৈলীর সঙ্গে টেরাকোটায় প্রকাশিত নৌকায় চড়া ইংরেজদের মিল আছে।

পাটাচিত্র

পুঁথির উপরের আবরণকে বলা হয় পাটা। বৈষ্ণব সাহিত্যের পুঁথির পাটা

গুলিতে প্রধানত রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনীর ছবি প্রকাশিত হয়। একাধিক

গোপী আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ লীলা করে বলেছেন। এই টেরাকোটা চিত্রটি যেন তারই বহিঃপ্রকাশ।

❖ উপসংহার

কাঁথা থেকে পট এই সমগ্র সামগ্রি গুলির মধ্যে একটা লোকায়ত ছাপ

বিদ্যমান। যেখানে ধ্রুপদী শিল্পের কারুকার্যের সঙ্গে মেসিনের সূক্ষ্ম নিপুনও অনুপস্থিত। এর থেকেই প্রকাশ পায় একটি মিউজিয়ামই পারে কোনো লোকায়ত শিল্পের সংরক্ষণের মাধ্যমে তার ধারাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে।

লৌকিক দেবী সপ্তভগিনী : উপেক্ষিতা কিন্তু অমলিন

শীতলা,চণ্ডি বা মঙ্গলার মতো আদরণীয় হয়েও সপ্তভগিনী বা সপ্তমাতৃকা আজও কেবল পথের ধারে গাছের তলায় আশ্রয় পেয়েছেন। কখনোই সুসজ্জিত মন্দির,দেবালয় বা রাজ আনুকূল্যে অট্টালিকায় তাঁদের স্থান হয়নি। লৌকিক থেকে সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়েও দেবদেবীর কুলীন সমাজে রয়ে গেছেন নিতান্ত ব্রাত্য। : **অভিজ্ঞান পাণিগ্রাহী ***

গাছের তলায় সাত বোন; মৈতনা পূর্ব মেদিনীপুর

সপ্তভগিনী বা Seven Sisters বললে প্রথমেই মনে আসে ভারতের উত্তর - পূর্বাঞ্চলের সাতটি অঙ্গ রাজ্যের কথা। রাজধানীর ঔজ্জ্বল্য থেকে আংশিক উপেক্ষিত দূরবর্তী এই রাজ্যগুলির মতো দেবী সপ্তভগিনী বা সপ্তমাতৃকা। এই সাত দেবী ,দেবদেবীর কুলীন সমাজে নিতান্ত ব্রাত্য থেকে গেছেন। পথের ধারে একান্ত অবহেলায় বট বা বকুল গাছের তলায় এঁদের স্থান হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগ, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং উড়িষ্যার বেশ কিছু স্থানে গ্রাম্য এবং প্রায় নির্জন পথের ধারে গাছের নিচে আজও দেবী সপ্তভগিনীর উপস্থিতি চোখে পড়ে।কালো মাটির সাতটি কলস দেবী রূপে পাশাপাশি রয়েছেন যেন ঝড় - বৃষ্টি, বন্যা - খরা ও ধুলো - মলিনতা বা উচ্চ বর্ণের

মানুষ ও কুলীন দেবদেবীর উপেক্ষা কে নিতান্ত ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার বঙ্গোপসাগর উপকুলের থানা রামনগর। এই রামনগর থানার অন্তর্গত মৈতনা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।মৈতনা গ্রামের নন্দ পাড়ায় শীতলা মন্দিরের সামনে রাস্তার ধারে বকুলতলায় রয়েছেন দেবী সপ্তভগিনী। শীতলা মন্দিরের পুরোহিত শ্রী গনেশ চন্দ্র কর মহাশয়ের মুখে মৈতনা গ্রামের এই সপ্তভগিনী দেবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনা যায় -

'আগে উত্তর মৈতনায় কাঁড়ার ও ডোম সম্প্রদায়ের লোকজন যাঁরা একসময় উড়িষ্যা রাজার যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে সাতটি পাথরকে সপ্তভগিনী দেবী রূপে পূজা করতেন।পরে ঐ অঞ্চলে আসা নন্দ ব্রাহ্মণেরা বনের মধ্যে এক গাছের নিচে সাতটি পাথর দেখতে পান। সংগ্রহ করে তাঁরা সেগুলিকে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ 'নন্দ' রা বনের থেকে তুলে আনলেও জাত্যাভিমানের কারণে লৌকিক এই দেবীদের পূজার দায়িত্ব না নিয়ে তা অর্পণ করেন 'কর' পদবীধারী পতিত ব্রাহ্মণদের হাতে।'

এছাড়া এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি,খাড় ও কাঁথির কাছে শীতলপুরে অনুরূপ ভাবে পথের ধারে সপ্তভগিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি এবং দাঁতনে সপ্তমাতৃকার কথা জানা গেছে। এছাড়া ভারতবর্ষের উড়িষ্যা, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি নানা রাজ্যে এই দেবীদের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় সপ্তভগিনী যেরূপ লৌকিক দেবী রূপে মানুষের অনেক কাছের হয়েছেন অন্যান্য রাজ্যগুলিতে তেমনটি দেখা যায় না। দাঁতনে দেবীদের সেবায়েত তাঁতি সম্প্রদায়ের শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া পাত্রের কথায় উঠে আসে দেবী সপ্তভগিনী তাঁদের কতটা আপন। তিনি আঞ্চলিক ভাষায় বলেন ' মু মন্ত্র জানেনি ,পূজাবি জানেনি তেবেবি দেবী মোর ঝিয়।' অর্থাৎ - 'আমি মন্ত্র জানিনা ,পূজাও জানিনা কিন্তু তাও দেবী আমার মেয়ে' ।এর থেকে আপন করে মানুষ আর কিভাবে নিতে পারে দেবীকে!

পুরাণে সপ্তমাতৃকার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার শিল্ড আবিষ্কার হয়েছে যেখানে সপ্তমাতৃকার প্রতীক উৎকীর্ণ। এতটা সুপ্রাচীন হলেও উচ্চ বর্ণের মানুষ মন্দিরে এই দেবীদের স্থান দেয়নি বা নিজের করে নিতে পারেনি। অবিভক্ত মেদিনীপুরের উপকুলীয় পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব উড়িষ্যায় তৃতীয় বর্গের মানুষের যাপনের দেবী হয়ে উঠেছেন 'দেবী সপ্তমাতৃকা'। লৌকিক দেবী রূপে সপ্তমাতৃকার নির্মোহ পুনর্মূল্যায়ন তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি ভাবনা।

*অভিজ্ঞান পাণিগ্রাহী, পঞ্চম সেমেস্টার, তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যাল, কলকাতা।

উপসংহার

তীর যত পেছনে টানা হয়, তা সামনের দিকে এগোয়। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা আত্ম চর্চার আরেক রূপ। বর্তমান সংকটের এই পরিস্থিতিতে নিজেকে উপলব্ধি করা ও সমাজকে চেনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবার সাহিত্য সমাজ থেকেই সৃষ্টি হয়। তাই সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে সমাজ সংস্কৃতিকে জানা ও চেনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এই সকল কারণ থেকেই এই ইন্টার্নশিপটি করার চেষ্টা করেছি।